http://www.elearninginfo.in

ধোঁয়া-ধুলো-নক্ষত্র

অসীম রায়

গরমের রাত। কলোনির লোকজন সবাই ঘুমোয়নি। মাঝে মাঝে হাওয়া উঠে হাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। আর তারই সঙ্গে রাস্তার পাশে চুড়ো করে জমানো পাঁকের গন্ধ আসে। ফেলুর মা রাতকানা। কিন্তু অন্ধকার তক্তাপোশের পাশে কুঁজো থেকে জল গড়াতে অসুবিধে হয় না। অন্যদিন জল গড়িয়ে মাজা বেঁকিয়ে সরে আসেন, কিন্তু আজ কিছু না ভেবেই পিঠটান করে উঠতেই শক্ত থলিটা পিঠে লাগে। বুঝতে পারেন না ওটা পেঁপের থলি না বোমার থলি। ফেলু দুটো থলিই দিয়েছিল সকালে। পায়খানার গায়ে যে পেঁপে গাছটা ঝুম ঝুম করছে পেঁপেতে তা থেকে পেঁপে পেড়ে থলি ভর্তি করে দাওয়ায় উঠে মা-কে ফেলু বলে, 'ভালো কইরা দেইখ্যা লও। দুইডা দুইরকম। একটা বড়,একটা ছোট। ভালো কইরা দেইখ্যা লও।'

ফেলুর মা এবার ঘুমোবার চেষ্টা করেন। কিন্তু ঠিক এই সময় দরজায় ধাক্কা পড়ে। নাঃ, ফেলু না। ফেলু এসে ডাক দেয়। ফেলুর মার মনে হল পুলিস। কিন্তু বাহির থেকে শান্ত গলায় হুকুম এলো, 'আমি বেণু, দরজা খুলুন।'

ফেলুর মা ত্রস্ত পায়ে এগিয়ে দরজা খুলে দেন। বাহিরে রাস্তার আলোয় নীল বুশশার্ট খাকি প্যান্ট পরা তিরিশ বছরের এক যুবককে দেখা যায়। রোগা ঢ্যাঙা ছেলেটা দু-পা এগিয়ে আসে। তারপর স্থির শান্ত গলায় বলে, 'আমি ফেলুকে খুন করেছি। পুলিসে জানালে বাড়ি জ্বালিয়ে দেব।'

হালকা পায়ে মিলিয়ে যায় ছোকরা। ফেলুর মা-র পাশে তার ছোট ছেলে রতন। আতঙ্কে তার চোখ ঠিকরে বেরিয়ে এসেছে। ফেলুর মা অন্ধকারে ছুটে যান। অভ্যস্ত হাতে এক হেঁচকায় থলিটা নামিয়ে রতনের হাতে দিয়ে বলেন, 'আমার রক্ত যদি তর গায়ে থাকে তবে উয়ারে মার এহনই। কি ! ভিরমি খাইয়া পড়লি ? যা, দৌড়া !'

অন্ধকারেও টের পাওয়া যায় রতন কাঁপছে। চৌদ্দঘোড়া রিভলবার যে চালায়, অবলীলাক্রমে ছুটন্ত ট্যাক্সি থেকে পুলিস অফিসারকে মেরে বছরের পর বছর হাওয়ায় মিলিয়ে যায়, যে থানায় ঢুকলে থানা অফিসার চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে ওঠেন, সেই মুকুটহীন রাজা বেণু বিশ্বাসের সামনে দাঁড়াতে হবে ভেবে তার জিভ শুকিয়ে যায়।

'বুঝছি। তরে দিয়া কিস্‌সু হইবে না। আমার বি-কম পাশ ছাওয়াল রে। আমার ইস্কুল মাস্টার ছাওয়াল !'

এতক্ষণ পর ফেলুর মা কাঁদতে বসেন। অন্ধকারে মেঝেয় বসে বিলাপ করেন। আর সেই ভাঙা বাঙাল বিলাপ শুধু ফেলুর জন্য নয়, মূলত তাঁর শ্বশুরের ভিটের জন্যে। ষোল-সতের বছর আগে হঠাৎ এক রাত্তিরে হুড়মুড় করে গহনা নৌকায় উঠে তাঁদের সেই পূর্ববাঙলা থেকে চলে আসার দিন, শেয়ালদা স্টেশনে পড়ে থাকার দিন, তারপর এই উত্তর

কলকাতার উপকণ্ঠে কাদায় বৃষ্টিতে হোগলার নিচে বছরের পর বছরের অস্তিত্ব—এইসব মিলে মিশে এই বিলাপ। এই সবে পয়সার মুখ দেখছে তারা। ফেলু অনেক দিন যাবৎ এদিক ওদিক করে শেষ পর্যন্ত বেণুর সঙ্গে ভিড়েছিল। তাদের ঘরে মালগাড়ি এসেছে মা লক্ষ্মী হয়ে।

পাথরের মত চৌকাঠে বসেছিল রতন। ঘণ্টা খানেক বিলাপের পর তার মা উঠে আসেন।

'দ্যাখ,কি হইল। দাদাটার কি হইল একবার দ্যাখ, একবার খুইজ্যা দেখ।'

কিন্তু রতন নড়ে না, তার চোখ তখনও আতঙ্কে স্বাভাবিকতা পায়নি।

'তুই কি করস ? অরে আমার ইস্কুল মাস্টার পোলা ! তুই কি করস ?'

এতক্ষণ পর ছেলেটা নড়েচড়ে বসে। রতনের বয়স কুড়ি একুশ হবে। পাশের কলোনির হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলে পড়ায়।

হঠাৎ খেপে উঠে, হাত দুটো মা-র সামনে নাচিয়ে বলে, 'ফেলু ফেলু ফেলু ! আমি কিছু করিনি ! পাঁচ টাকা দশ টাকা করে মাস মাস টিউশনি করলাম। ফেলুর মত মালগাড়ি ভাঙার দলে নই বলে কি আমরা মানুষ নই ?'

'তুই মাইয়ালোক। তুই পারস ফেলুর মত বাড়ি বানাইতে ?' ফেলুর মা পাকা মেঝেতে লাথি মারেন।

হঠাৎ দাঁড়িয়ে ওঠে রতন। তারপর নিঃশব্দে পাশের ঘরে চলে যায়। লুঙ্গি ছেড়ে কালো প্যান্ট পরে। তারপর বাতায় গোঁজা ফেলুর বহু ব্যবহৃত সঙ্গীটাকে পায়ে বেধেঁ নেয়।

'কই যাস ?' বসা গলায় রতনের মা হাঁক দেন। রতন জবাব দেয় না।

তাদের নতুন টিনের চালে জ্যোৎস্না আটকে আছে। একটা বেঁটে নারকেল গাছ দুবছর হল ফল দিচ্ছে, সেটা হাওয়ায় মড়মড় করে ওঠে। রতনের মা বলেন, নারকেল গাছটাই তাদের ভাগ্য ফিরিয়েছে। যেবার তার জালি পড়ল গাছে, ঠিক সেই সপ্তাহেই ফেলু চার হাজার টাকার স্টিল রড ভাঙলে মালগাড়ি থেকে। রতন জানে এ সমৃদ্ধি তার সারাজীবনের আওতায় বাইরে। তার একশো চল্লিশ টাকার মাইনেতে তাকে আরও চার পাঁচটা বাড়ির মত কাঁচা মেঝের কিংবা শান বাঁধানোর ব্যর্থ চেষ্টায় আরও কদাকার মেঝেতে শুয়ে দিন কাটাতে হত।

রতন বাড়ির বাইরে এসে জোরে জোরে নিশ্বাস নেয় দাদার এই আকস্মিক মৃত্যুসংবাদে তার গত কয়েক বছরের সমস্ত ভাবনাচিন্তা একেবারে ওলোটপালট লাগে। পাশে দুখানা টিনের চালওয়ালা বাড়ি একেবারে নিস্তব্ধ। এখানেই বেণুর আড্ডা। দ্বিতীয় বাড়িটা দীপ্তি দাসের, বেণুর তৈরি। বেণু মাঝে মাঝে এ-বাড়ি আসে। রতন আঁচ করে দীপ্তিকে নিয়েই হয়তো গণ্ডগোল। বাড়িটার কাছে আসতেই আর একবার থমকে দাঁড়ায়। দীর্ঘনিশ্বাসের মত গরমের হাওয়া উঠে আসে। আর তার সঙ্গে সঙ্গে ধুলো। পাক খেতে খেতে শুকনো পাঁক মেশানো ধুলো রতনের নাকে মুখে ঝাপটা দেয়। এরপর একটা আধবোজা পুকুরের সহসা উপস্থিতি। সেই বেনো জলে চাঁদের আলো দেখে বুকের ভেতরটা রতনের একবার সিরসির করে ওঠে। জল ছেঁচলে বোধহয় দুটো মানুষের কঙ্কাল এখনও বেরতে পারে। এরপর পাঁচ-

ছখানা টালির বাড়ি। এরা কিছু করতে পারল না। কুড়ি বচ্ছর জিলিপি আর বাসি ছানার মিষ্টি করে কাটিয়ে গেল। কিন্তু এদের দু-তিনটে ছেলে ইতি-মধ্যেই ফেলুর সাকরেদ হয়েছিল। পাকিস্তান থেকে চোরাই সুপুরি আর চাল এলে সেগুলো ছেনতাই করত। এ-বিজনেসটা ভারত-পাক যুদ্ধের আগে পর্যন্ত বেশ চালু ছিল। ট্রেন থেকে মেয়েদের দল যখন মাল পাচারে ব্যস্ত, তখন তাদের ওপর অতর্কিত আক্রমণের নেতা ছিল ফেলু। তারপর ব্যবসাটা একদম ফেল পড়ে গেল। ফেলু ভিড়ল বেণুর দলে।

এবার বড় রাস্তা। দুটো লরি হু হু করে বেরিয়ে যায়। একটা কুকুর চাঁদের দিকে চেয়ে বিলাপ করতে শুরু করে। রাস্তার দুধারে টালি-খাপরার সারবন্ধ দোকান। মোড়টায় এসে থমকে দাঁড়ায় রতন। ঠিক যা ভেবেছিল তাই। রামপ্রসাদ বসে আছে। পেট্রোম্যাক্স জ্বলছে। সামনে খাটা ড্রেন আর ছাইগাদার পাশে দুটো নতুন র‍্যালে সাইকেল তাদের প্রকাণ্ড বৈপরীত্যে ঝলমল করছে। পেট্রোম্যাক্সের আলোয় স্পষ্ট দেখা যায় রামপ্রসাদের দৃষ্টি দোকানের ভেতর নয়, রাস্তায় দিকে। তার চোখ পাহারা দিচ্ছে দোকানের গায়ে চওড়া গলি, থানায় যাবার গলি।

রতন ফেরে। সরু কাঁচা শুকনো কাদায় অসমান গলি দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে পাশের কলোনিতে পড়ে। আবার বড় রাস্তা। গ্যারাজমুখী খালি বাস বেরিয়ে যায়। একসঙ্গে অনেকগুলো কুকুর ডাকতে ডাকতে থামে। রতন রাস্তা পেরয়। পেরিয়েই বন্ধ মাংসের দোকান। দোকানের পাশে ঘাসের এক কোণে পাঁঠার রক্ত কালচে হয়ে জমে আছে। রিক্সা-স্ট্যাণ্ডে এখনও সবাই ঘুমোয়নি। গাঁজার কলকে হাতে গোল হয়ে কয়েকটা মানুষ। একটা মিশমিশে কালো ঢ্যাঙা লোক কলকেতে সজোরে টান দেওয়ায় তার মুখের দুপাশ আলো হয়ে ওঠে। সেই আলোকিত গালের দিকে সাবধানে এক নজরে তাকায় রতন। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে। হাঁটতে হাঁটতে পিঠ ঘেমে গেছে। থানার পেছনের গলি দিয়ে নিঃশব্দে বারান্দায় উঠে আসে রতন। সান্ত্রী ঢুলছিল চেয়ারে বসে বসে। তড়াক করে লাফিয়ে ওঠে। দুটো স্ট্যাবিং কেস চুকিয়ে বড়বাবু এই মিনিট পনের ফিরেছেন। ফ্যানের নিচে শার্ট খুলে গা এলিয়ে নিবিষ্ট মনে নাক খুঁটছেন, রতনকে দেখে ধড়মড় করে উঠে বসলেন।

'কি ব্যাপার ? এত রাতে ? কটা বেজেছে জানেন ?'

'বেনু আমার দাদাকে খুন করেছে।'

ক্লান্তিতে বড়বাবু অজিত বিশ্বাসের হাই উঠছিল।মাঝপথে হাই বন্ধ হয়ে যায়। স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন আগন্তুকের দিকে।

'বেণু এসেছিল, মাকে বলে গেল সে ফেলুকে খুন করেছে, বলে গেল, পুলিসে খবর দিলে ঘর জ্বলে যাবে।'

এবার ছোকরাকে চিনতে পারেন বড়বাবু। এ অঞ্চলের সমস্ত রাফ্‌দের তিনি মুখ চেনেন। রতন এ দলে নেই সে কথাও বিলক্ষণ জানেন।

রাত্তিরে দেড়টায় আবার একটা নতুন ঝামেলা পাকিয়ে উঠেছে ভেবে খিঁচিয়ে উঠলেন। 'তা এসেছ কেন ? ঘর যদি জ্বলে যাবে তবে এসেছ কেন ?'

পাশে যে সাবইন্সপেক্টরটি সামনে লম্বা খাতার হলদে পাতা ভর্তি করছিল সে কলম থামিয়ে বললে, 'লিখে নেব স্যার ?'

'তুমি তোমার কাজ করো।'

সে ছোকরাও বোধহয় এইটিই চাইছিল। সে খাতা বন্ধ করে টেবিলের ওপর মাথা রেখে শোয়। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই তার গভীর নিশ্বাসের শব্দ ওঠে।

অবসাদে পা টলছে রতনের। সামনের চেয়ারটার দিকে আঙুল দেখিয়ে বললে, 'বসতে পারি ?'

'বিলক্ষণ ! এখন হাতে ছুরি থাকলেও তাদের চা খাওয়াই। সিঙ্গাড়া চলবে ?'বড়বাবুর গলায় চাপা ঠাট্টায় রতন চটে।

'একটা কিছু করুন। একটা লোক খুন হয়ে গেল আপনার চোখের সামনে।'

বড়বাবুর বয়স চল্লিশ বিয়াল্লিশ। কুচকুচে কালো দীঘল পেশীসচ্ছল চেহারা। হাতে-ঘাড়ে অতীতের ব্যায়ামচর্চার স্পষ্ট ইঙ্গিত। রতনের কথা শুনে বড়বাবু শরীরটা গুটিয়ে নেন। যেন প্রতিপক্ষের আক্রমণ রুখছেন।

'আমার চোখের সামনে ?'

'আমি তো বলছি, আমার দাদাকে খুন করেছে। খুনী নিজে এসে বুক ফুলিয়ে বলে যাচ্ছে বাড়ির ওপর। আর তাই সহ্য করতে হবে আমাদের ?'

'নিজের চোখে দেখেছ ?'

মুহূর্তের জন্যে চুপ করে যায় রতন। তার কচি পাতলা গোঁফআঁটা ছোট মুখখানায় আত্মবিশ্বাসের অভাব স্পষ্ট।

'আমি শুনেই দৌড়ে এসেছি থানায়।'

'বাঃ বেশ !' এতক্ষণের চাপা হাইটা এবার প্রবল প্রত্যয়ে ঠেলে ওঠে বড়বাবুর মুখ দিয়ে। দুবার তুড়িও দিলেন সঙ্গে সঙ্গে।

'তার মানে আপনারা কিছু করবেন না ?'

'না।'

রতন ওঠে পড়তে যাচ্ছিল। অজিত বিশ্বাস বললেন,'বোসো বোসো। তোমার নাম রতন, না ? ইস্কুল মাস্টার, না ? দেখেছ সব খবর রাখি।'

চারমিনার সিগারেট ধরান বড়বাবু। রতনের দিকে খোলা প্যাকেটটা ঠেলে দিয়ে বলেন, 'তুমি ভাল লোক। তোমার সঙ্গে আমার সঙ্গে তো কোনো গণ্ডগোল নেই বাবা। তুমি এর মধ্যে আসছ কেন ? কাল ইস্কুল বন্ধ ?' নাক মুখ দিয়ে ধোঁয়া বার করতে করতে বললেন।

'ফেলু আমার দাদা।' নীচু গলায় বলে রতন।

'তা তো নিশ্চয় ।' আবার এক গাল ধোঁয়া ছেড়ে শূন্যে তুড়ি দিয়ে ছাই ফেলেন বড়বাবু 'তবে সে তো খুব ভাল লোক ছিল না, নিজেই বলো।'

ঠিক এই জায়গায় এলেই রতন এক প্রবল ব্যথায় অবসন্ন বোধ করে। দাদা গুণ্ডা একথা

সে খুব ভালভাবে জানে। কিন্তু তার আশা ছিল দাদা শোধরাবে। ফেলু বিয়ে থাওয়ার কথা ভাবছিল, সংসার পাতবার কথাও ভাবছিল। রতনের আশা ছিল সে যদিও তর্ক করে তাকে শোধরাতে পারবে না, কিন্তু সময়ের চাপে অবস্থার গতিকে সে অন্য মোড় নেবে।

'গুণ্ডারা তো মারামারি করেই মরে।' অজিত বিশ্বাস সামনের খোলা লম্বা খাতাটা বন্ধ করেন। পুরনো তেলচিটে দেয়াল ঘড়িটায় ঘড়ঘড়ে দুটো বাজার শব্দ আসে। বোধহয় বড়বাবু তাল করছেন উঠবার।

মস্ত লম্বাচওড়া টেবিলটার ওপর চোখ বুলাতে বুলাতে রতন বলল, 'বেণু দাসও তো গুণ্ডা।'

'হ্যাঁ গুণ্ডা। তবে গুণ্ডারা বড় হয়ে গেলে তারা আর গুণ্ডা থাকে না।'

'তারা কি হয় ?'

'তারা। তারা তখন রাজা। আমরা তাদের হুকুম তামিল করি।' সুন্দর ঝকঝকে দাঁতের পাটি বার করে অজিত বিশ্বাস হাসেন।

রতন এবার সোজা হয়ে বসে। একটা প্রবল রাগ পাক খেয়ে তার গলা পর্যন্ত উঠে আসে।

'যদি গুণ্ডাদের সেলাম বাজান, তাহলে অত ঠাট করে কোমরে রিভলভার এঁটে ঘুরে বেড়ানোর কি দরকার ?'

বড়বাবু রুমাল বের করে তাঁর গাল কপাল ঘাড়—আগাপাস্তলা মুছতে শুরু করেন। নিজের মনে বিড়বিড় করেন, 'আজকের ঘুমটাই শালা গেল !' তারপর রতনের দিকে চেয়ে বলেন, 'বলছি' আবার একটা সিগারেট ধরান। চোখ বন্ধ করে ধোঁয়া ছাড়েন। তারপর হঠাৎ মুখ খুলে স্বগতোক্তির স্বরে বলতে থাকেন, 'আমি শিকদার নই ভাই। শিকদার জানো তো ? কানুর গুলিতে মরল। তারপর মরার পর মেডেল পেল। আমি ভাই মরার পর মেডেল পেতে চাই না। শিকদারের দুই ছেলের কি হয়েছে জানো ? পুলিশ অফিসারের ছেলে। ওয়াগন ভাঙার ট্রেনিং পায়নি। এ অঞ্চলে যদি থাকত, তোমার দাদার দলে ভিড়ে যেত। আমরা ভাই ছাপোষা মানুষ, খেয়েপরে বাঁচতে চাই। বেণুকে অ্যারেস্ট করা কি আমার কাজ ? বেণুকে কে পারে অ্যারেস্ট করতে ? মিনিস্টার পারে ? স্বয়ং ভগবানও পারবে না। ওঁরা ক্ষণজন্মা পুরুষ। এ অঞ্চলে যেখানেই যাবে সেখানেই বেণু। এই থানায় বসে বসে মাঝরাতে সেই বেণুধ্বনি শুনছি আর কাঁপছি।'

'আপনারা এত অথর্ব, এত অসহায় ?'

'হ্যাঁ স্যার। আমার যে হাত-পা বেঁধে রেখেছেন স্যার। তাছাড়া...'হঠাৎ গলা খাটো করে বড়বাবু বলেন, 'কানু তো আবার আসবে কবছর পর।'

আবার একটা অসোয়াস্তি বমির মত পাক খেয়ে খেয়ে ওপরে উঠতে থাকে। রতন প্রায় চিৎকার করে বলে, 'সে লোকটার তো যাবজ্জীবন হয়েছে, তবে ?'

'আবার তো ফিরবে।'

এবার তীক্ষ্ণ গলায় রতন বলে উঠল, 'আপনি কি বলছেন বড়বাবু ? অত বছর পরও

আমাদের দেশের অবস্থা এমনিই থাকবে ?'

বড়বাবুর প্রকৃতপক্ষে ঘুম ছুটে গেছে। চোখ দুটো লাল হয়ে উঠলেও হাই উঠছে না বোধহয় ক্রমাগত সিগারেট খাওয়ার দরুন। জুত করে চেয়ারে পা তুলে বসে জিজ্ঞেস করেন, 'এক একটা কলোনিতে কটা লোক আছে বলো তো ?'

রতন বিরক্ত হয়ে বলে,'এসব কথা কেন ?'

বড়বাবু সে কথায় কান না দিয়ে বলে যান, 'এক-একটা কলোনিতে পাঁচ ছয় সাত হাজার লোক, এরা যখন এলো তখন শুরুই করল তাদের জীবন জবরদখল দিয়ে, বুঝলে ? চাকরি নেই, ব্যবসা নেই, রাস্তা নেই, আলো নেই। সাপ মশা পাঁক। এখানে যদি ক্রাইম না হবে, কোথায় হবে ? তার ওপর ঘরে ঘরে সোমত্থ মেয়ে—সবাই এক একটা বোমা। আর ফেলুও তো মরল ঐ তোমাদের বাড়ির পাশের দীপ্তি দাসকে নিয়ে। মাঃ ! আর কত দেখব !' শেষ বাক্যটা এবার বিশাল হাইয়ে তলিয়ে যায়।

রতন চেঁচিয়ে ওঠে। এতক্ষণের রাগ ক্ষোভ, অবসাদে সে ফেটে পড়ে, 'আপনার ওসব কচকচি ছাড়ুন বড়বাবু। দাদা রাস্তায় পড়ে আছে, আপনারা কিছু করবেন ?'

এবার চেয়ার থেকে পা নামিয়ে খাড়া হয়ে বসেন অজিত বিশ্বাস। চোখে চোখ রেখে বললেন,'তুমি, তোমার মা, কোর্টে দাঁড়িয়ে বলতে পারবে—বেণু তোমাদের বলেছে সে খুন করেছে ফেলুকে ?'

বড়বাবুর প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে রতনের চোখের সামনে ভেসে ওঠে তাদের বাড়ির কাছেই সেই বেনো জলে চাঁদের আলো। আর সঙ্গে সঙ্গে শিরদাঁড়া সিরসির করে।

'তোমার মা পারবে ?'

রতন স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে।

'তবে ? এতক্ষণ যে এত চেঁচামেচি করছিলে, এবার কি ? একটু সাহস দেখাও। ভয় কি ! তুমি পার্টি করো না ? আমি সব খবর রাখি। যাও, তোমার দাদাদের কাছে যাও !' চাপা উল্লাসে চকমক করে বড়বাবুর চোখ।

'তাই যাব।'

'যাবে ? ভয় করবে না ?যে তোমাদের এত করেছে তাকে গুণ্ডা বলবে ? অ্যাঁ ?'

'আমাদের পার্টি গুণ্ডাকে প্রশ্রয় দেয় না।'

বড়বাবু উঠে পড়েন ? 'বাড়ি যাও, বাড়ি যাও। আজ রাতটা থাক। লাশ থাক ওখানে।....শেয়াল এক আধটা থাকতে পারে...ও কিছু হবে না। ভোরে গাড়ি যাবে।'

জড়ভরতের মত রতন বসে থাকে। এতক্ষণ সমাজতাত্ত্বিক আলোচনার মাঝখানে সে যেন আশ্রয় পেয়েছিল। এখন আশু কর্তব্য কি ভেবে পায় না। এখন সে কি করবে ? ফেলুর লাশ বাড়ি নিয়ে আসবে, না.... কিন্তু অধীরদার বাড়ি এত রাতে ?

বড়বাবু উঠে পড়েন। ঘেমো শার্টটা শুকিয়েছে কিনা আলোর দিকে পরীক্ষা করেন। তারপর সেটা দলা পাকিয়ে তুলে নেন। বারান্দায় তাঁর গেঞ্জিপরা ফর্সা পিঠখানা অন্ধকারে মিলিয়ে যায়।

এতক্ষণ যে সাবইন্সপেক্টরটি কুঁই কুঁই করে সুরেলা নাক ডাকছিল, তাদের কথাবার্তার সঙ্গে তাল রেখে সে হঠাৎ উঠে বসে। চোখ কচলিয়ে দুহাত শূন্যে তুলে আড়মোড়া ভেঙে বলে, 'যান-যান, ভোরে ট্রাক পাঠামু,যান !'

রাস্তায় নেমে রতন ঠোক্কর খায় । চাঁদ অস্ত গেছে। অন্ধকার আকাশে কয়েকটা অস্পষ্ট ম্লান তারা মিটমিট করছে। দিকভ্রষ্টের মত হাঁটতে হাঁটতে প্রায় রামপ্রসাদের দোকানের গায়ে এসে উঠেছিল। তারপর পেট্রোম্যাক্স আলোর গায়ে হাসির আওয়াজ উঠতেই তার তন্দ্রা কাটে। রতন পেছন ফেরে। এবার কাঁচা রাস্তাটা অন্ধকার। আবার আধবোজা পুকুর। বাজপড়া একটা নারকেল গাছের ডগা ঝুঁকে আছে জলের দিকে।

রতন দাঁড়িয়ে পড়ে জোরে জোরে নিশ্বাস নেয়। কাছে-পিঠেই মদ চোলাইয়ের গোপন কারখানা। কাজ পুরোদমে চলছে। রতন লক্ষ্যভ্রষ্টের মত হাঁটতে থাকে পাশের কলোনি দিয়ে। খেয়াল নেই, একটা গলি ভুল করে তাদের ইস্কুলের গলিতে এসে পড়েছে। লম্বা টিনের চালের শূন্য দাওয়া অন্ধকার, খাঁ খাঁ করে। পা ধরে গেছে রতনের। অন্ধকার দাওয়ায় এসে বসতেই একটা সাদা পাটকেলি বড় দেশী কুকুর তার কাছে এসে লেজ নাড়াতে থাকে। রতন অন্যমনস্কভাবে তাদের ইস্কুলের ভুলুয়া কুকুরটার মাথার হাত বোলায়। কাল সকালেই ক্লাস ফাইভের অঙ্কের ক্লাস। বত্রিশ প্রশ্নমালার ঐকিক নিয়মের অঙ্ক। রতন দীর্ঘশ্বাস ফেলে দাঁড়িয়ে ওঠে। এবার আর সে ইতস্তত করে না। সামনে যে দুটো রাস্তা বেরিয়েছে তার বাঁ-টা ধরে এগিয়ে সোজা সাদা একতলা বাড়িটার দাওয়ায় উঠে আসে।

রাস্তার গায়েই ঘরখানায় তক্তপোশের এককোণে অধীর চ্যাটার্জি শুয়ে।

'অধীরদা অধীরদা,—আমি রতন।'

সঙ্গে সঙ্গে শ্লেষ্মা ঝাড়ার শব্দ। 'দাঁড়াও,আলো জ্বালি।'

আলো জেলে লুঙ্গি আঁটতে আঁটতে দরজা খুলে বেরিয়ে আসেন বছর পঞ্চান্ন বয়সের একজন লোক। গেঞ্জির ওপরে কণ্ঠার হাড় উঁচিয়ে আছে। চশমা ছাড়া বলেই চোখদুটো ঘোলাটে, দৃষ্টিহীন। ঘরে রতনকে ডেকে তক্তপোশের কোণে বসতে বললেন। একেবারে নিরাভরণ ঘর। দেওয়ালে লেনিনের ছবি। বাড়িতে কাচা সাদা শার্ট আর ধুতি দেওয়ালে টাঙানো। অধীর চ্যাটার্জি বিয়ে-থাওয়া করেননি। আগে কলোনির আরও ভেতরের দিকে ছিলেন। দশ বছর হল বোনের বাড়িতে এই ঘরটার বাস করছেন।

অধীরদা আরও কয়েকবার গলা ঝাড়েন। নিজের মনে বিড়বিড় করেন, 'সর্দিটা এখনও ওঠেনি।'

'দাদাকে বেণু খুন করেছে।'

বহুদিনের অভ্যাসমতো বিড়ি ধরান অধীরদা। আস্তে আস্তে বলেন, 'বেণু এসেছিল ?'

'হ্যাঁ, বাড়িতে এসে বলে গেছে।'

আবার কাশেন, গলা ঝাড়েন। 'সর্দিটা এখনও যাচ্ছে না, বুঝেছ ?' নিজের মনেই বলেন।

রতন হঠাৎ অধীর হয়ে বলে, 'আমাদের কি কোনো রাস্তা নেই অধীরদা ? কানু আর

বেণু এরাই যেরকম চালাবে তেমনি সব চলবে ? লেনিন স্ট্যালিন-মাও সে-তুঙ,এর কি মানে আছে ?'

এবার চশমার খাপটা বালিশের তলা থেকে বার করেন অধীরদা। গালে কাঁচা-পাকা দাড়ি। চশমা পরতেই শীর্ণ মুখে চোখদুটো জ্বলজ্বল করে উঠে।

'উত্তেজিত হয়ো না রতন। উত্তেজিত হয়ে কি করবে ? তুমি তো আর বাইরের লোক নও। বাইরের লোকদের মত কথা বলো না।'

কিন্তু এই শান্ত ধীর গলায় অস্থিরতা বোধ করে রতন। যা কোনোদিন সে স্বপ্নেও ভাবেনি ঠিক তাই করলে। ক্ষ্যাপার মত চেঁচিয়ে উঠল,' ওরকম ব্লাফ দিচ্ছেন কেন অধীরদা ? বলুন খোলাখুলি, আপনারা বেণুর হাতের পুতুল। তাহলেই ব্যাপারটা চুকে যায়।'

'বেণু খুব খারাপ কাজ করছে। দেখা হলেই আমি তাকে বলব।'

'ব্যস, আপনার কর্তব্য চুকে গেল, না ?'

বিড়িটায় কয়েকবার শেষটান দিয়ে জানলার বাইরে অন্ধকারের দিকে ছুঁড়ে দেন। আবার ধীর গলায় বলেন, 'তুমি আজ যাও রতন। এখন যাও। লাশ বাড়িতে আনার ব্যবস্থা করো। আমার ভোর পাঁচটায় গেট মিটিং আছে রসিকলালের ফ্যাক্টরিতে। একটা গোলমাল হতে পারে। আমি সেখান থেকে সোজা আসছি।'

'তার মানে আপনার দ্বারা কিস্‌সু হবে না, কিস্‌সু না,' ঠিক যেভাবে তার মা তাকে বলেছিলেন অবিকল সেই ভাবে রতন বলে।

'দ্যাখো রতন, বিশ বছর এখানে পড়ে আছি। কেউ আমাকে এভাবে কথা বলেনি'- হঠাৎ তাঁর গলা চড়ে যায়, 'এই জলকাদায় বনবাদাড়ে লাঠি হাতে দাঁড়াতে কে শিখিয়েছে ? কোনো শালা এখানে এসেছিল হামলা ঠেকাতে ? কোনো মিঞা আসেনি। আমি ব্লাফ দিচ্ছি, আমি বেণুর হাতে পুতুল ? ও সব কথা বাইরে বোলো। খবরের কাগজে ফলাও করে লেখো। যারা আমাদের সম্পর্কে দিন-রাত কুৎসা ঢালছে তাদের দলে ভেড়ো। এখানে কেন ?' রতন চুপ করে থাকে। অধীরদা যা বললেন তার একবর্ণও মিথ্যে নয়। এই কাদায় বাঁশ দরমা বেঁধে যেখানে কলোনি গড়ে উঠেছে সেখানেই অধীর চাটার্জি তাঁর বরাভয়ের হাত প্রসারিত করেছেন। সরকার থেকে বাড়ির জন্য ঋণ, স্কুলের জন্য গ্রান্ট আদায়—এ সমস্তের মূলেই তিনি।

'আমার মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে অধীরদা', রতন মৃদুগলায় সঙ্গে সঙ্গে যোগ করে দেয়, 'কিন্তু বেণুর বিরুদ্ধে কিছু করতে পারেন না ?'

'নাঃ ! বেণুকে আমাদের দরকার।'

'যেমন আপনাদের প্রতিপক্ষের দরকার ছিল কানুকে। তাহলে কগজে কাগজে যে লেখে আমাদের পার্টি গুণ্ডা পোষে তাই ঠিক ?'

'কাগজে আমি পেচ্ছাপ করি। আমাকে এত রাতে উত্তেজিত কোরো না রতন ! তাহলে ব্যাপারটা বলি, শোনো। আমরা যাই করি না কেন—এসেমব্লি করি, ময়দান মিটিং করি সবসময় আমাদের সশস্ত্র বিপ্লবের জন্যে তৈরি থাকতে হবে। আর অস্ত্র কারা ব্যবহার

করবে ? কলেজের অধ্যাপক সাহিত্যিক ? যারা বোমার সামনে বোমা নিয়ে দাঁড়াতে পারে, দরকার হলে স্টেনগান চালাতে পারে, তাদের ওপর নির্ভর করতে হবে। ওসব রাশিয়া চীন, সব দেশেই এক অবস্থা। অস্ত্র ধরনেওয়ালা লোক চাই।'

লুঙ্গি আর গেঞ্জিপরা লোকটার চোখ জ্বলজ্বল করে। নির্বাক রতনের দিকে ঝুঁকে পড়ে অধীর চ্যাটার্জি বলেন, 'মনে আছে সেই ভয়ঙ্কর দিনগুলোর কথা ? যখন কানু দত্তের ভয়ে এ তল্লাট কাঁপত। লোকটা প্রকাশ্য দিবালোকে বাজারের মধ্যে মেয়েদের কাপড় টেনে খুলে উলঙ্গ করে দিয়েছিল—পাঁট টাকা বাজি জিতবার জন্যে। একটা লোক প্রতিবাদ করবার সাহস করেনি। ফ্যাক্টরি মালিকের সঙ্গে হাত মিলিয়ে আমাদের কমরেডদের খুন করেছে আর আমরা থানায় গেলে থানা অফিসার নাক খুঁটেছেন। সেই সব ভয়ঙ্কর দিনগুলোর কথা এর মধ্যে ভুলে গেলে ? তখন বেণু এগিয়ে এসেছিল রিভলবার হাতে। আমি সেকথাটা বেমালুম ভুলে যাব ?'

'কিন্তু অধীরদা, বেণু তো ডাকাত ! তাহলে আমার কি হবে অধীরদা ?' রতন হঠাৎ ভুকরিয়ে ওঠে। 'আমি ভেবেছিলাম অন্যরকম হবে। আমিও কি ভিড়ে যাব বেণুর দলে ?'

অধীর চ্যাটার্জি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেললেন। 'শান্ত হও রতন, শান্ত হও। এসব মিটে গেলে আর একদিন এসো তখন কথা হবে।'

'না, অধীরদা, আপনাকে বলতে হবে। আমাদের কি আর কোনো আশা নেই ? কোনো ভবিষ্যৎ নেই ?"

আর একটা বিড়ির ডগায় ফুঁ দিতে দিতে হঠাৎ থেমে যান অধীরদা, ধীরেধীরে বলেন,'আছে। যেদিন আরো লোকের চেতনা বাড়বে। যখন আর রেণুকে কোনো দরকার হবে না।'

'আপনি যে কবিতার মত কথা বলছেন, অধীরদা।'

রতনের তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের হাসি চোখ এড়িয়ে যায় না অধীরদার। বললেন, 'কবিতা ? তাহলে তাই।'

'আমি যাই অধীরদা।' হঠাৎ ভীষণ অসহায় লাগে রতনের গলা।

'আবার এসো।'

রাস্তায় বেরিয়ে রতন অন্ধকার ঘর থেকে গলা ঝাড়ার আওয়াজ পায়।

আবার রতন ঘুরপথ নেয়। ভোরের প্রথম লক্ষণ আকাশে। একটা তারা জ্বলজ্বল করে। আবার ইস্কুল, এটা মিডল প্রাইমারি। রতন মনে মনে হাসে। এত ঘন ঘন ইস্কুল কেন ? এ কথাটা কোনোদিন এমন তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠেনি মনের মধ্যে। জনপদের সঙ্গে সঙ্গেই বিদ্যালয়, কিন্তু কেন ? রতন নিজেকে আর ফেলুকে দুই বিপরীত ধারা রূপে দেখতে পায়। সে আর ফেলু, ইস্কুলে পড়ানো আর ওয়াগন ভাঙা, এই দুটোই রাস্তা। এ দুটো মূল্যবোধের কোনটা জয়ী হবে শেষ পর্যন্ত ?

আবার দীর্ঘশ্বাসের মত হাওয়া দিতে থাকে। একটু শীতল ভাব লাগে। একটা শিশুর কান্না শোনা যায়, তারপর হাঁচির আওয়াজ। দরমার ঘরখানা থেকে হাঁচির আওয়াজ শুনতে

শুনতে রতন মোড় ফেরে। সামনেই বাড়ি। দরজা খোলা। মা যেমন বসেছিলেন ঠায় তেমনি বসে আছেন। রতন নিঃশব্দে ঘরের মধ্যে ঢোকে। মা একবার ফিরেও তাকান না। বোধহয় বসে বসে ঘুমচ্ছেন। সেদিকে চেয়ে চেয়ে তাদের প্রথম কলকাতা আগমনের দিনটা মনে পড়ে রতনের। শেয়ালদা স্টেশনে মানুষের পুঁটলি। চারিদিক ভেজা, নাকপোড়া ব্লিচিং পাউডারের গন্ধ। রিফিউজিদের মধ্যে বসন্ত লেগেছে। মস্ত বড় করে লাল শালুতে লেখা, 'বসন্তের টিকা নিন।' তার মধ্যে তারা কুঁকড়ে শুয়েছিল পুরো দশ বারোটা দিন। 'হাটকে হাট্‌কে' বলে ক্রমান্বয়ে কুলিদের হাঁক আর অহর্নিশি পদধ্বনি। প্রথম তিন চারটে রাত্তির রতন ঘুমোতে পারেনি। মাঝে মাঝে গায়ে টর্চ পড়েছে। চোরাই মালের জন্যে স্টেশনের এধার ওধার খানাতল্লাসী চলেছে। তখন বুঝতে পারেনি। মাঝ রাতে ঘুম ভেঙে শুনেছিল একটা কমবয়সী মেয়েকে নিয়ে হৈ হৈ। একজন বৃদ্ধ চেঁচাচ্ছে, 'ও মাগী আমার মেয়ে না !' তার মায়ের স্থানু মূর্তির দিকে চেয়ে চেয়ে তার কত কথাই মনে পড়ে। হঠাৎ গুলি খেলবার সময় ফেলুর চোট্টামির কথাও মনে আসে। তারপর ফেলুর চায়ের দোকান, যেখানে ইয়ার বন্ধুদের খাওয়াতে খাওয়াতে সে ফেল মারল। তার সঙ্গে তার দাদার মেজাজের কোথাও একটা প্রবল অমিল ছিল কিন্তু এক প্রবল মমতাও বোধ করে দাদার জন্যে। ফেলু সব ব্যাপারে নিজেকে জড়িয়ে ফেলে লেবড়ে যেত। আত্মরক্ষার দরজাগুলো তার সবসময় বন্ধ হয়ে যেত। দাদা তাকে তার পথে অনেক ভিড়বার চেষ্টা করেছিল। ছুরি খেলা শিখিয়েছিল। বলেছিল, 'তোর হবে, তোর কব্জিতে অসাধারণ জোর।' কিন্তু সে পথে রতন যায়নি। তবে না গিয়েই বা কি হয়েছে ? রতন আর ভাবতে পারে না। ক্লান্তিতে তার মাথা ঝিমঝিম করে। আর ঠিক এই সময় দাওয়ায় হাল্‌কা পায়ের আওয়াজ আসে। সঙ্গে সঙ্গে রতন খাড়া হয়ে ওঠে। সামনেই বেণু দাঁড়িয়ে, মুখে হাসি।

'তোর দাদাকে শেয়ালে খাচ্ছে। নিয়ে আয়।'

রতন জড়ভরত। কোথায় জিজ্ঞাসা করবে ভেবেছিল কিন্তু গলা দিয়ে আওয়াজ বেরয় না।

'রামপ্রসাদের বাড়ির গায়, দুটো গুলি বুকে দিয়েছি, একটা কপালে। কেউ জানতে পারলে তোকেও দেব।'

রতন ঝিমোয়। তার সমস্ত চিন্তাশক্তি তার আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে। একবার ভাবলে এরকম ঝিমোতে ঝিমোতে রাতটা কাটিয়ে দিলে হয় না ? বেণু কখন চলে গেছে। একলা একলা নাটকীয় ভাবে টেনে টেনে হঠাৎ বলে ওঠে,'যেদিন লোকের চেতনা বাড়বে তখন আর বেণুকে কোনো দরকার হবে না।'

বিড়বিড় করতে করতে বেরিয়ে আসে রতন। দরজায় স্থানু মূর্তিটা থেকে হাঁক আসে,'কই যাস ?'

রতনের কানে সে ডাক পৌঁছয় না।

হলদে রঙজ্বলা পাঁচিলের গায়ে এক চিলতে জমি। তার বুকে মানকচুর ঝোপ। কালচে সবুজ সতেজ চেটালো পাতাগুলোর দিকে রতন সম্মোহিতের মত চেয়ে থাকে। নিচেই

ফেলু। বুকে সাদা শার্টের ওপর কালো দুটো রক্তের বৃত্ত। কপালে চুলেও রক্ত চাপ বেঁধে আছে।

রতন ফেলুর পাশে হাঁটু গেঁড়ে বসে। ফেলুর ঠোঁটের কোণে তার বাল্যকালের হাসি ফুটে উঠেছে, সেই যখন গুলি খেলায় চোরামি করে সে মজা পেত। রতন তার বুকের ওপর মাথাটা রাখতে গিয়ে আবার ভোরের আকাশখানা দেখে। আর সেই ভোরের আকাশের একটা তারা। দাদা বলে একবার ডাকবার ইচ্ছে হয় তার। কিন্তু তার বাকশক্তি সে বোধহয় হারিয়ে ফেলেছে। আবার মুখ তুলে আকাশটা দেখবার দেষ্টা করে। এবার চোখে পড়ে একখানা হাসিতে ভরা মুখ, বেণু ঝকঝকে দাঁত বের করে হাসছে।

রতন আবার মুখ নীচু করে। তারপর আলগোছে পায়ের দিকে হাত বাড়ায়। কাঠের বাঁট শক্ত করে চেপে ধরে। বেণু কিন্তু হাসি থামায়নি। এখনও সে হাসছে। রতন সেই হাসির দিকে তার সমস্ত শরীরটা ছুঁড়ে দেয়।

পুনারবর্ত